বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.004

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* : বয়ানে মন্তাজ

মৌমিতা রায়*

সারসংক্ষেপ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসে আখ্যান বয়ানের গভীরে যে সূক্ষ্ম নির্মাণকৌশল লুকিয়ে আছে, তা অনেকক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের 'মন্তাজ' বা সম্পদনার নীতির সমান্তরাল। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপন্যাসের নিবিড় পাঠের মাধ্যমে ইলিয়াস কীভাবে একই বাক্যে উত্তম ও নামপুরুষের মিশ্রণ ঘটিয়ে দৃষ্টিকোণের মিথস্ক্রিয়া তৈরি করেন, তা দেখানো হয়েছে। তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগের সংকট এবং রাজনৈতিক স্বপ্নভঙ্গের স্মৃতিকে মূর্ত করতে তিনি ইন্দ্রিয়ের অতি-সংবেদনা ও সামূহিক অবচেতনের যে বিন্যাস ঘটিয়েছেন, তা-ই কার্যত ভাষিক 'মন্তাজ' হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধ *খোয়াবনামা*-য় ব্যবহৃত এই চালচ্চিত্রিক কৌশল কতটুকু অভিনবত্ব তৈরি করেছে তারই বিশ্লেষণ প্রয়াস।

চাবি শব্দ : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, মন্তাজ, মন্তাজ, দৃষ্টিকোণ, দেশভাগ, মিথস্ক্রিয়া।

১

বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) উপন্যাসের নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে এর কাহিনি-বয়ান কৌশল বিশ্লেষণ করা, যেখানে ইলিয়াসের গদ্যভঙ্গির চমৎকারিত্বের উৎস-অনুসন্ধান করা হবে। তাঁর উপন্যাসে মূলত টুকরো টুকরো ঘটনা আর টানটান কথার মন্তাজ-এ পট নির্মিত হলে সেখানে কয়েকটি চরিত্র বিম্বিত হয় এবং চেতনাপ্রবাহের বিস্তার ঘটে[১] –বিষয়টি সমালোচকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও, এ-যাবৎ পর্যালোচিত হয়নি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *খোয়াবনামা* উপন্যাসের ভাষায় যে মন্তাজ তৈরি করেন তা নির্মাণের কৌশল হলো দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে একই বাক্যে মিশ্র পুরুষের মিথস্ক্রিয়া সাধন, ইন্দ্রিয়ের অতি-সংবেদনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দৃশ্যায়নের বিস্তৃতিকে গুটিয়ে আনা, মনোগহিনের সামষ্টিক অবচেতনের নির্মিতি ইত্যাদির মিশেলে বিবরণধর্মী পরিচর্যায় ধাঁধা সৃষ্টি করা। এই পরিচর্যারীতি তিনি বেছে নেন তেভাগা আন্দোলনের উত্তুঙ্গ মুহূর্তে কৃষক-দাবি কবজা করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে, একে পাকিস্তান আন্দোলনে রূপ দেয়া এবং এরপর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা ও স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদি সংকটের বয়ান তৈরি করতে গিয়ে; তাঁর রচিত ভাষ্যে বাংলাভাগ নিজেই একটি মন্তাজ হয়ে ওঠে।

এ-প্রসঙ্গে মন্তাজ ধারণাটি আলোচনার দাবি রাখে :

> the filmic technique of one shot cutting to an implicitly connected shot to create a synthetic perception that is neither the first nor the second shot. Leaping from image to image, the viewer's consciousness concludes the dialectics of montage by synthesizing imaginatively, associationally.[২]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

–মন্তাজ এমন একটি পরিচর্যা রীতি যেখানে দুটি দৃশ্য পরপর সংযোজন করে সংশ্লেষণ ঘটানো হয়, ফলে দৃশ্যদুটির অর্থের বাইরে তৃতীয় একটি তাৎপর্য মননশীল দর্শকের রাডারে ধরা পড়ে। মন্তাজ হলো চলচ্চিত্রের সম্পাদনা রীতি, আবার সাহিত্যে পরিচর্যা-কৌশল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে দৃশ্য সম্পাদনার প্রয়োজনে মন্তাজ ধারণার উদ্ভব। এর চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয় সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যখন সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইন (১৮৯৮-১৯৪৮) বিশ্ব-চলচ্চিত্রে বিপ্লব আনলেন। তাঁর মতে, ছবির প্রতিটি দৃশ্যে এমন উপাদান থাকবে যা এককভাবে এবং তার পূর্বের ও পরের দৃশ্যের সঙ্গে সংযুক্তভাবে দর্শকের মনকে ক্রমাগত আকৃষ্ট চমকিত ও উদ্বেলিত করবে।[৩] সে সময় 'আইজেনস্টাইন যে সম্পাদনা রীতির উদ্ভব করেছিলেন তাকে তিনি 'Montage of Attractions' আখ্যা দিয়েছিলেন'।[৪] 'তথাকথিত প্লট বা কাহিনীর অনুপস্থিতি, কেন্দ্রস্থ কোনো নায়ক চরিত্রের অনুপস্থিতি– এসব ছিল তখনকার যুগে অভাবনীয়'।[৫]

মন্তাজের আঙ্গিক বিশ্লেষণে একে চারটি রূপে ভাগ করা হয় : শব্দ-বাক্য-ইমেজ সাজানোর ফলস্বরূপ পদ্ধতি সাপেক্ষ উপায়; কাল সাপেক্ষ উপায় (স্থান অভিন্ন, কালের পরিবর্তন); স্থান সাপেক্ষ উপায় (কাল অভিন্ন, স্থানের পরিবর্তন); উপাদানের সম্পর্ক সাপেক্ষ উপায় (ইমেজগুলির রৈখিক, সমান্তরাল, সমপৃষ্ঠ, বিপ্রতীপ বা দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনা)।[৬] 'সম্পাদনার সরল কোলাজ মোটেই মন্তাজ নয়, কেননা মন্তাজের 'greatest-creative-multiple impulse' ওতে নেই'।[৭]

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগ নিবিড়। এদের বিভিন্ন উপাদানকে সমন্বিত করার পদ্ধতির মধ্যেও গভীর মিল রয়েছে। পূর্বজ-প্রাচীন সাহিত্যের থেকে নানান ঋণ গ্রহণ করেছে চলচ্চিত্র। স্বয়ং আইজেনস্টাইন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট ও পুশকিনের কবিতার চলচ্চিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।[৮] এছাড়া মন্তাজরীতির মূর্ত ফর্মের জগৎ থেকে অনুভূতির বিমূর্ত জগতে চলে যাওয়া আরও প্রাঞ্জল প্রাচীন জাপানি হাইকু কবিতাগুলিতে; আইজেনস্টাইন এদের বলেছেন এক-একটা মন্তাজের দৃশ্য-তালিকা[৯]।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বয়ানকৌশল চলচ্চিত্রের মন্তাজের মতন শক্তিশালী প্রকাশ-মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রথমে বিবরণ প্রদানের বেলায় দৃষ্টিকোণ নির্ণয়ে কীভাবে মন্তাজ ঘটে তার বিশ্লেষণে আসা যাক। উপন্যাস তো আর সিনেমার মতো ভিজ্যুয়াল মাধ্যম নয়, তাই এখানে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হলে আমরা বুঝতে পারি একটির পর একটি শট নেয়া হচ্ছে; একটি ঘটনাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে, নানা রূপে দেখানো হচ্ছে। কথাসাহিত্যে দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেনের অভিমত স্মর্তব্য: মূলত, একজন কথাসাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ নির্ণয় কবির কবিতার ছন্দ-নির্বাচনের মতই সচেতনা-সাপেক্ষ।[১০]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বয়ানকৌশল নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব একই বাক্যে মিশ্র পুরুষের ব্যবহার। এর ফলে যদিও বাক্যে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়, তবে নাম পুরুষের কাজটিকে পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া যায়; তার মানে হলো আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রত্যক্ষণ

(perception) নিয়ে খেলতে শুরু করেছেন এবং কথকের (narrator) আড়াল ঘুচিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসছেন। তিনি এক পৃথক সত্তা হিসেবে উপন্যাসে হাজির থাকছেন এবং এমন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছেন কাহিনির ওপর, যে তাঁর নির্মিতি একেবারে স্বতন্ত্র ও প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কেবল লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ এবং চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর মিশ্রণ সম্পাদনা করেই ক্ষান্ত হন না। এ ধরনের কাজ কথাসাহিত্যের বিকাশ-পর্ব থেকেই বহুবার ঘটেছে বাংলা গল্প-উপন্যাসে। তিনি একই কাহিনিভাগে চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করে উত্তম-পুরুষ আমি হয়ে ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পর, ঘটনা এবং চরিত্র থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক অবস্থান থেকে ঘটনাটির বর্ণনা দান করেন নাম-পুরুষ 'সে' ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে। পরিণামে ঘটনাটি পাঠকেরা দুটি অবস্থান থেকে দেখতে পারেন, একটি চলমান ঘটনা-প্রবাহের অংশ হয়ে এবং অন্যটি নির্মোহ, দূরবর্তী, পৃথক অবস্থান থেকে। উদাহরণস্বরূপ : *'রেইনকোট'* গল্পে দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে এই স্বভাবটি বজায় রেখেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। সম্পূর্ণ গল্পটি বয়ান করা হয়েছে রচয়িতার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ ব্যবহৃত হয়েছে নাম পুরুষবাচক সে বা চরিত্রের নাম। কিন্তু পুরো গল্পটি চেতনাপ্রবাহ রীতিতে রচিত হওয়ায়, নুরুল হুদার প্রেক্ষণবিন্দুর যুক্ততা থাকায়, গল্পটি মনে হয় আমার তথা পাঠকের বয়ানে সৃষ্ট। লেখক 'আমি' ও 'সে' একাকার করে ভাষিক বিভ্রাট ঘটান, ফলে মনোজাগতিক টানাপড়েনের ব্যাকরণহীন চিন্তাপ্রবাহ জমজমাট হয়ে ওঠে।

*খোয়াবনামা*র প্রথম বাক্যটিকে ব্যবচ্ছেদ করলেই দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে মিশ্র পুরুষের ব্যবহার কীভাবে এবং কেন সাধন করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তা বোঝা সম্ভবপর হবে :

> পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে/ যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে/ গলার রগ টানটান করে/ যতোটা পারে উঁচুতে তাকিয়ে/ গাঢ় ছাই রঙের মেঘ তাড়াতে/ তমিজের বাপ কালো কুচকুচে হাত দুটো নাড়ছিল,/ ঐ জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করা দরকার।[১১]

– প্রথম ছয়টি ক্রিয়া সংঘটিত করে তমিজের বাপ কিন্তু সপ্তম ক্রিয়াটি লেখক পাঠককে সঙ্গে নিয়ে করছেন। বাক্যের প্রথম অংশের ছয়টি ক্রিয়া নাম পুরুষের দৃষ্টিকোণে রচিত, পরবর্তী অংশ উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে রচিত। 'যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে' বাক্যাংশের 'যেখানে' বাদ দিয়ে বাক্যটি সরল রূপে নাম পুরুষে লেখা যেত এভাবে : পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলার রগ টানটান করে যতোটা পারে উঁচুতে তাকিয়ে গাঢ় ছাই রঙের মেঘ তাড়াতে তমিজের বাপ কালো কুচকুচে হাত দুটো নাড়ছিল। কিন্তু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাক্যের পরবর্তী অংশে ('ঐ জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করা দরকার') উত্তম পুরুষ 'আমাদের' সর্বনামটি উহ্য রেখে জটিল বাক্য নির্মাণ করেছেন প্রধান খণ্ডবাক্যটি জুড়ে দিয়ে। একইসঙ্গে, দেখার বিষয়, এখানে স্থান অভিন্ন কিন্তু কালের পরিবর্তন ঘটছে অর্থাৎ কাল সাপেক্ষে মন্তাজ নির্মিত হচ্ছে ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড টেকনিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

লক্ষণীয়, বিবরণধর্মী পরিচর্যা রীতির ব্যবহারের সময় দৃষ্টিকোণের মিশ্রণ তৈরির মধ্য দিয়ে (শটের মিশ্রণ ঘটে) মন্তাজ সৃষ্টি করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। *খোয়াবনামা*র উদাহরণ :

> তখন কি বিল কি জমি, কি পানি কি ডাঙা কারো কোনো আব্রু নাই। তখন মানুষ বলো, গোরুবাছুর বলো, মেয়েমানুষ বলো আর ছোলপোল বলো, মাছ বলো শামুক বলো, –সব, সব শালা উলঙ্গবাহার হয়ে বেহায়ার মতো খ্যামটা নাচন নাচে।[১২]

– এখানে রৈখিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে উপাদানের সম্পর্ক সাপেক্ষে মন্তাজ ঘটছে। লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবরণ দেওয়া হচ্ছিল, এর মধ্যে চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। চরিত্রের দৃষ্টিকোণ আচমকা ঢুকে পড়ে তার বলার ভঙ্গি, আঞ্চলিক শব্দ এবং নিজস্ব অনুভূতিসমেত। তবে তা বিবৃত হয় একই অনুচ্ছেদে, এমন-কি কোনো উদ্ধৃতিচিহ্নের আড়ম্বর-ব্যতীত। অঘোষিত এই প্রবেশ পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ পাঠককে সাথে নিয়েই (পূর্বের উদ্ধৃতিতে) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *খোয়াবনামা*র যাত্রারম্ভ করেছেন। এরপর এগিয়ে গেলে কয়েকটি বাক্যের পর আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপমা নির্বাচনে পাঠক অনুমান করতে পারে যে লেখকের সঙ্গে মিশে যাওয়া এই দৃষ্টিকোণটি মাঝিপাড়ার কারও হতে পারে :

> রাত বাড়ে, বিল জুড়ে তার (পাকুড় গাছ) ছায়া খালি ছড়াতে থাকে, ছড়াতেই থাকে। অমাবস্যার ঘনঘোট অন্ধকার কি পূর্ণিমার হলদে জ্যোৎস্না কিংবা কৃষ্ণপক্ষের ঘোলা লাল আলোয় সেই সমস্ত ছায়া গতরে মুড়ে ... –সব, সবই মায়ের কাছে ভাতের জন্য কাঁদতে কাঁদতে গায়ে মাথায় জাল জড়িয়ে ঘুমিয়ে-পড়া মাঝিপাড়ার বালকের মতো একটানা নিঃশ্বাস নেয়।[১৩]

– আবারও স্থান নিশ্চল কিন্তু কাল বহমান। একইসঙ্গে পুনরাবৃত্ত 'সব' ছান্দিক মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে, ফলে রিদ্‌মিক মন্তাজ ঘটছে। বিবরণের এক পর্যায়ে আরও কতক বাক্যের পর একই অনুচ্ছেদে স্পষ্ট হয় যে দৃষ্টিকোণটি তমিজের বাপের ছিল : 'মুনসিকে এক নজর দেখার সুযোগটা নিতেই তমিজের বাপের এখানে আসা।'[১৪]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে-উপন্যাসে বিবরণ প্রদানের বেলায় প্রেক্ষণবিন্দুর অভাবনীয় বিমিশ্রণ লক্ষ গ্রাহ্য হয় কখনো এবং আমরা বলতে পারি এখানেই তাঁর নিজস্বতা সুচিহ্নিত। দৃষ্টান্ত :

> ক. বিলের শিওরে পাকুড়গাছে বসে সকাল থেকে শকুনের চোখে মণি হয়ে ঢুকে মুনসি সূর্যের আকাশ পাড়ি দেওয়া দেখবে, দেখতে দেখতে হঠাৎ রোদে মিশে গিয়ে রোদের সঙ্গে রোদ হয়ে ওম দেবে বিলের গজার ...আর পুটির হিম শরীরে।[১৫]
>
> খ. জয়নাব তার বন্ধ চোখ দিয়ে ওহিদুল্লাহর খোলা নোনা দুই চোখে অদৃশ্য সব ছবি এবং অনেক আগে সম্পন্ন গতিবিধি প্রকাশ করে দেয়।[১৬]

ক-সংখ্যক দৃষ্টান্তে, মুনসি শকুনের রূপ ধরে আছে। শট শকুনের চোখের মণিতে থমকে থাকে, পরে বিছিয়ে যায় বিলের বিস্তীর্ণতায়, তখন রঙের বদল ঘটে সূর্য-রশ্মির পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে– এই দৃশ্যের মাত্রা অন্তত একদিনব্যাপী। আমরা যদি ভুলে না যাই যে, উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট দুইশো বছর বিস্তৃত তাহলে এই দৃশ্য সংযোজনের মাত্রা এবং টোন বোধগম্য হবে; ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজে উত্তীর্ণ এ-দৃশ্যটি তাৎপর্য বহন করে দুইশো বছরের রূপান্তরের।

ওপরের দুইটি উদাহরণে যথাক্রমে একজন মৃত (মুনসি) এবং অন্যজন মৃতপ্রায় (মা) ব্যক্তি অন্যের চোখে নিজের দেখার কাজটি প্রদান করার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিকোণের সংশ্লেষণ তৈরি করে, ধৃতরাষ্ট্রের সঞ্জয়ের চোখে কুরুক্ষেত্র-দর্শনের মতন। মন্তাজ সৃষ্টিতে পাশাপাশি শটগুলোর বিন্যাসে এদের

সংযুক্তির মাঝে ডিজল্‌ভ্‌ (দ্রবীভূতকরণ), ফেইডস (বিবর্ণকরণ), সুপার ইম্পোজিশন (দুটো শটের মিশ্রণ), ওয়াইপ (মুছে ফেলা) ইত্যাদি ইফেক্ট সম্পাদনায় ব্যবহৃত হয়। ওপরে যেমন খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পের জয়নাব ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে ওহিদুল্লাহর দৃশ্যপট পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

সমালোচক শহীদ ইকবাল মনে করেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাসের মৃত্যুদৃশ্যে ফ্যান্টাসি ও ইমেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়। পাঠক ও লেখকের মাঝে মনে হয় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বুঝি এ দৃশ্য বর্ণনা করছে।[১৭] এর তাৎপর্য হলো, মৃত বা লোকান্তরিত ব্যক্তি বিশ্বাসীর মনোজগতে সর্বদা জাগরুক। মৃত মুনসি এবং সন্ন্যাসীর বিদ্যমানতায় ভক্তি-বিশ্বাস স্থাপন *খোয়াবনামা* উপন্যাসের অস্তিময়তার গভীর-তলের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করছে। ফলে, তমিজের বাপ কিংবা বৈকুণ্ঠের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে বিশ্বাসের দুনিয়ায় বিদ্যমান মুনসি-সন্ন্যাসীর কাহিনি, সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে উঠিয়ে আনেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

২

ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতিসংবেদনশীলতা, বিচলন এবং সর্বগ্রাসী হয়ে দৃশ্যজুড়ে ছড়িয়ে, বিছিয়ে পড়া লক্ষণীয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিবরণ-নির্মিতিতে। নিচের উদাহরণে লক্ষণীয়, গন্ধ, শব্দ এবং আলোর আয়োজনে, বিস্তৃতি রূপান্তরিত বা দ্রবীভূত (ডিজল্‌ভ্‌) হচ্ছে বিন্দুতে; খোয়াবের প্রকৃতিও তাই, বিষয়টি *খোয়াবনামা*র দ্বিতীয় মন্তাজের উৎস-ভূমি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

> গন্ধ : খাওয়া দাওয়ার পর বৈকুণ্ঠের জর্দার নেশা-ধরা গন্ধে ছোটো বারান্দাটা আরো চাপা হয়ে আসে। এমন কি ছোটো উঠানটাও উঠে আসে ধানের তুষের গন্ধ নিয়ে। তারপর তমিজের বাপের ঘরটাও এই বারান্দায় আসন পাততে চাইলে তমিজের পা ছুঁয়ে যায় কেরামতের হাটুর সঙ্গে।[১৮]
>
> শব্দ : তার এই ধ্যান মূর্তিতে আর তিনজনে একেবারে চুপ করে যায় এই নীরবতার সুযোগে কুলসুমের একটানা কান্না চেপে বসে গোটা বাড়িতে, বাড়ির সামনের ডোবা এবং ডোবারও ওপারে রাস্তা, রাস্তা ডিঙিয়ে শেষ বিকালের ধানকাটা জমিও সেই কান্নার কবজা হয়ে একটি অখণ্ড পিণ্ডের আকার নেয়।[১৯]
>
> শব্দ ও আলো : বাড়ির সামনের খুলি পার হয়ে ডোবার কোমর পানিতে অল্প একটু বুদবুদ তুলে বুদবুদের টুপটুপ বোল নিজের শরীরে বরণ করে আওয়াজটি রাস্তা ডিঙিয়ে ওই বোলের সবটাই ঝেড়ে ফেলে শিশির পড়ার ফিসফিসানি মেনে নিয়ে ঢুকে পড়ে সন্ধ্যার খাপের মধ্যে এবং কুয়াশা ঝোলানো কালচে গোলাপি আসমানকে মিশমিশে কালো করে আসমানকে তো বটেই, ওই সঙ্গে নিজেকেও একেবারে আড়াল করে দেয়। বলতে কী, চেরাগ আলি ফকিরের গানের গড়িয়ে চলাতেই গিরির ডাঙায় সেদিন সন্ধ্যা নামলো একটু আগেই।[২০]

জর্দা ও ধানের তুষের গন্ধ, কুলসুমের কান্নার শব্দ, এরপর চেরাগ আলী ফকিরের গানের শব্দ ও গিরির ডাঙায় আঁধার নামা– এই তিন আয়োজন যে স্থান-কাল তথা দৃশ্যের যোজনা করছে তা সরলভাবে লং এবং ক্লোজ শট নেওয়ার মাধ্যমে রচিত নয়; বরং এখানে অনুভূতির সম্মিলন ঘটানোর মধ্য দিয়ে একটি দৃশ্যের মধ্যে আরেকটি দৃশ্য অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, বিশেষত শেষোক্ত শব্দ ও আলোর মিশ্রণে (সুপার ইম্পোজিশন), মেখে গিয়ে মন্তাজ তৈরি করছে।

৩.

খোয়াবনামা উপন্যাসের বিবরণ-পটে মন্তাজ সৃষ্টির সঙ্গে চরিত্র বিম্বিত করার সম্পর্কের বিষয়টি পর্যালোচিত হবে এই পরিচ্ছেদে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চরিত্রনির্মাণ কৌশলের লক্ষণীয় দিক হলো : মহৎ চরিত্রায়নের বিপরীতে গিয়ে চরিত্র নির্মাণ করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। অর্থাৎ, উপন্যাসে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের যোজনা হয় অতি-বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে যেখানে চরিত্রগুলো দৈনন্দিন ভাবনাচিন্তা, ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সাধারণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, আর সম্পূর্ণ কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে গালগল্প আকারে। যেমন উপন্যাসের ঘটনাভাগে দেখা যায় মাঝির বংশের তমিজ চাষির জাতে উঠতে চায় বলে ফুলজানকে বিয়ে করে। বিয়ে করার পথ সুগম করতে সে আগেই ফুলজানের অনাগত সন্তানের পিতা হয়ে নেয়। এরপর সে বিয়ের আসরে জমি লিখে না দিলে বিয়ে করবে না বলে ঝামেলাও সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকেই তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা না করে– চাষা হওয়ার জন্য যা দরকার তা-ই করতে মরিয়া– এমন একটি চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। অন্যদিকে উপন্যাসের শেষে তমিজ তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে কি-না এমন একটি শোনা কথা বা গুজব গালগল্পের মাধ্যমে উঠিয়ে আনা হয়।

ইসমাইল হোসেন চরিত্রটিও একই আদলে নির্মিত হয়েছে। সে তেভাগার কর্মীদের হাতে রাখে শ্বশুরবাড়ির জমিদারি সামাল দেওয়ার জন্য, এমন বিবরণ উপন্যাসে হাজির হয় বিস্তারিত চিন্তন-ক্রিয়ার আকারে। অথচ দেশভাগের পরে হিন্দুদের জমি দখল দূরে থাক, অল্পমূল্যে কিনে নেওয়ার প্রস্তাবেও সে মানবিকতা বোধের কারণে সম্মত হয় না, এমন দৃশ্যায়ন রচিত হয় না, সংযোজিত হয় কেবল অপরের মুখে শোনা কথার আকারে।

খোয়াবনামা উপন্যাসটিতে তমিজের মতো তেভাগা-কর্মীকে গ্রাস করে প্রকট হয়ে ওঠা মুসলিম লীগ নেতা ইসমাইলের বিকাশকে যদি ধরা যায় এই উপন্যাসের কাহিনি-সূত্র, তাহলে পরিষ্কারভাবেই লক্ষণীয় কেন্দ্রীয় ব্যক্তি-চরিত্র নয়, চিন্তা বা আদর্শের বাহক হয়ে উঠছে কাহিনির চরিত্ররা; যা মন্তাজ রীতির টাইপেজ[২১] (Typage) ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

অর্থাৎ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে মহৎ চরিত্র নির্মাণ করার বদলে লাভ-ক্ষতির হিসেব কষা সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করার প্রবণতা লক্ষণীয়। মহৎ কাহিনিগুলোকে তিনি অন্য লোকের মুখে শোনা-কথার বিবরণ আকারে হাজির করেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কোনো ব্যক্তিমূর্তি তৈরি করতে চান না, তিনি জনসমষ্টির যৌথতা নির্মাণ করতে চান।

ঔপন্যাসিক সত্তা, স্বপ্ন, সময় এবং বিলয় একীভূত আকারে উপস্থাপন করেন মুনসি, সন্ন্যাসী, চেরাগ আলী, তমিজের বাপ এবং তমিজ চরিত্রের বিন্যাসে। এদের কারোরই মৃত্যুদৃশ্য নির্মাণ করেন না, এটিও হয়ে ওঠে গালগল্প-নির্ভর এবং এদের দেহত্যাগের মধ্য দিয়ে মহত্ত্ব-প্রাপ্তি হয়, তারা পরিণত হয় লোককথার নায়কে। এভাবেই তারা যৌথ-নির্জ্ঞানে ঠাঁই করে নেয়।

খোয়াবনামা উপন্যাসে সামষ্টিক অবচেতন রূপ লাভ করেছে, চেরাগ আলীর ‘পাওয়া শোলক’ হয়ে উঠেছে যার আধার। তার বিপরীতে উপস্থাপন করা হয়েছে তেভাগা ও পাকিস্তান নিয়ে কেরামতের

রচিত কবিতাকে। অর্থাৎ একদিকে হয়ে ওঠা লোক-পুরাণ ধারণ করে আছে চেরাগ আলীর শোলক, অন্যদিকে লিখিত ইতিহাস নির্মাণ হচ্ছে কেরামত আলীর কবিতা বা গানে। দুজনের পার্থক্য বিবরণ, কথোপকথন এবং মূল্যায়ন আকারে হাজির হয় নিম্নরূপ উদাহরণসমূহে :

> ক. চেরাগ আলির গলা ভারি, কিন্তু নদীর পানিতে, পানির বাতাসে আর বাতাসের হিমে ও তাপে সেই স্বরে ভাঙনের চিহ্ন, চিড় খাওয়ার দাগ। সেখানে বিজলির এরকম রাগী গর্জন নাই।[২২]
>
> খ. তেভাগা তো হয়েই যাচ্ছে, কেরামতের তখন কদর আরো বাড়বে।... পাকিস্তান হয়ে পড়ায় তার 'লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না' বইটার বিক্রি পড়ে গেছে। ইসমাইলের কথায় সে এখন 'নয়া ওয়াতন পাকিস্তান' নামে একটা গান বাঁধার কথা খুব ভাবছে।[২৩]
>
> গ. (কেরামত:) ...তোমার শোলক লেখা লাগবি তোমাক লিজে। হামার গান বান্দি হামি লিজেই।...
>
> (চেরাগ আলী:) এই গান লেখবার পারবা? না হামি পারমু? গান বান্দা এক কথা আর পাওনা শোলক আরেক জিনিস।[২৪]
>
> ঘ. তমিজের বাপ শোনে আর ভাবে, হায়রে, কোনকালের সব পাওনা গান গড়াতে গড়াতে এই ফাতড়া মানুষটার (কেরামত) পাল্লায় পড়ে সেটার কী চেহারা হয়েছে...[২৫]

চেরাগ আলীর হয়ে ওঠা বাংলার প্রকৃতিকে ধারণ করে, তার স্বর গড়ে তুলেছে নদীমাতৃক বাংলার প্রকৃতি, তার দর্শন কালের চিহ্ন আত্মস্থ করে পাওয়া। কিন্তু কেরামত চলে বাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে, সে জনপদের ইচ্ছাকে বহন করে না বরং নির্মাণ করে, সে গান বাঁধে, গান লেখে। এই বঙ্গের মানুষের প্রত্যাশাকে ধারণ করে চেরাগ আলী আর মেনে নিতে বাধ্য হওয়া বাস্তবতায় রূপান্তরিত-রূপ উঠিয়ে নিয়ে আসে কেরামত; এর ফলে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়।

উপন্যাসের দর্শনভাগ প্রধানত রচিত হয় বিবরণে। *খোয়াবনামা*র বিবরণপটে ভাষা প্রশ্নেও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লক্ষবিন্দু গণমানুষের জীবনজীবিকার ওপর নিবদ্ধ। ফলে এর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থার সমালোচনা করেন তিনি তির্যক ভাষা-বুনটে। উপন্যাসে প্রভুর প্রতি দাসসুলভ আনুগত্য থেকে তাদের মতো করে ইংরেজি শেখা এবং ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার রাজনৈতিক সংগ্রামের বৈপরীত্য তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস–

> কয়েক পুরুষের জমিদারি, পিতামহের মন্ত্রিত্ব ও এক পুরুষ গ্যাপ দিয়ে নিজের উপমন্ত্রিত্ব এবং তিন পুরুষ ধরে বিয়ে-করা ও না-করা ইংরেজ ও এ্যাংলো ইনডিয়ান মেমসায়েবদের সঙ্গে প্রেম ও যৌবন সঙ্গম প্রভৃতি কারণে খাঁটি সায়েবদের সাহচর্যের ফলে খান বাহাদুরের গলার ভেতর থেকে বেরুতে বেরুতে বাঙলা ভাষা অনেকটাই দুমড়ে যায়। বাঁকা বাঙলা, ভাঙা উর্দু ও সায়েবদের চেয়েও সায়েবি ইংরেজির মিশেলে মুসলমান কৃষকের ওপর হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের জুলুমের কথা বলতে বলতে তার গলা ভারাক্রান্ত হয়, আট মিনিটের বেশি বলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।[২৬]
>
> কোরান ও সুন্নার আদর্শে জীবন যাপন করার লক্ষে পাকিস্তান কায়েমের জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান বাঙলা ভাষায় জানালেও নিজের পেশাগত অভ্যাসের কারণে এবং সৈয়দ আমির আলির 'স্পিরিট অফ ইসলাম'-এর প্রায় অর্ধেকটাই মুখস্ত থাকার ফলে সাদেক উকিলের বেশির ভাগ কথাই বেরিয়ে আসে ইংরেজিতে। ইসলামের বিজয়গাথা প্রচার ও সেই সঙ্গে রাজভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বজায় রাখতে তার মনোযোগ, যত্ন ও নিষ্ঠা একেবারে নিরঙ্কুশ।[২৭]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন কীভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে পর্যবসিত হচ্ছে অর্থাৎ ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধিতা মুছে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতির ধারণার উদ্ভব হচ্ছে কীভাবে, রাজনীতির সে প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এখানে। এক-একটি বাক্যে এতোগুলো প্রসঙ্গ এমনভাবে উঠে এসেছে যে গতিশীল প্রতীকী দৃশ্যগুলো মুহূর্তের মধ্যে তীক্ষ্ণ-তাৎপর্যময় বোধে সাড়া জাগাবে পাঠককুলের মধ্যে, চলচ্চিত্রে যে কাজটি করে ইন্টেলকচুয়াল মন্তাজ। উপনিবেশের দাসত্ব থেকে ইংরেজি এবং ধর্মভীতি হতে জাত আরবি-উর্দু কিংবা সংস্কৃত আকর্ষণ কীভাবে গণমানুষকে ভাষাহীন, অধিকারহীন করে তোলে তা-ও দেখানো হয়েছে উপন্যাসে :

> এরকম কঠিন সংস্কৃত কথা চেরাগ আলির জিভে আসবে কী করে?[২৮]
>
> মওলানার মোনাজাত হচ্ছিলো উর্দুতে, উর্দুতে সমবেত জনতার অজ্ঞতা এই ভাষার প্রতি তাদের ভক্তিতে উস্কে দেয় এবং এর রহস্যময়তা আরবি আয়াতের সঙ্গে সবরকম ফারাক মোচন করে।[২৯]

এখানে লক্ষণীয়, ওপরের দুইটি উদাহরণেই অজ্ঞতা দূরত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ফলশ্রুতিতে এক ধরনের ভক্তি-ভাবাবেগ তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ জনতার সমস্যার সমাধান না মিললেও তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছে, পরিণামে ভাষিক-রাজনীতির কার্যকারণ-পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হচ্ছে।

বক্তব্য নির্মাণে *খোয়াবনামা* উপন্যাসে বাংলাভাগ নিজেই একটি মন্তাজ হয়ে ওঠে। যেমন সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : Montage is the whole film.[৩০] হিন্দু এবং মুসলমান তাদের নিজেদের ভেতরে কত জাত-পাতের বিভাজন মানে তার কাহিনি তৈরি করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস; ফলে হিন্দু আর মুসলিম দুই জাতি – এই তত্ত্বের পাশে *খোয়াবনামার* কাহিনি বিভ্রম সৃষ্টি করে। *খোয়াবনামায়* বিদ্যমান জাত নিয়ে অন্তত দুইটি পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, উপন্যাসে মুসলমান চরিত্রের ক্ষেত্রে গিরিডাঙার মাঝিদের হানাফি জামাতের অনুসারী, নিজ গিরিরডাঙার চাষীদের মোহাম্মদি জামাতের অনুসারী এবং মাদারপাড়ার ফকিরদের মাদার তরিকার অনুসারী হিসাবে দেখানো হয়। পরবর্তীতে আবদুল কাদেরের বিয়ের ঘটনার সূত্রে লক্ষণীয় যে, 'সমাজের উঁচুতলায় 'জাত' পুঁজিতান্ত্রিক লগ্নি ও ক্রয়বিক্রয়ের বিষয় হয়ে ওঠে'[৩১]। একইসঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ নায়েব, জগদীশ সাহা, যুধিষ্ঠির কর্মকার, কায়স্থ জমিদার, বৈকুণ্ঠ গিরি প্রত্যেকে আলাদা জাতের অধিভুক্ত।

দ্বিতীয়ত,

> *খোয়াবনামায়* মাঝি বা জেলে, কামার, ফকির প্রভৃতি সমাজের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কও দৃশ্যমান হয়।... বাংলায় ১৭৬০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে সংঘটিত ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যে প্রভাব যমুনার চরাঞ্চল থেকে কাৎলাহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তার স্মৃতি ও উত্তরাধিকার যৌথভাবে বহন করে এই সব জাতের মানুষ। ফলে উপন্যাসে বিদ্রোহের এই স্মৃতিকে তাদের সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়।[৩২]

ফলে, বলা যেতে পারে হিন্দু-মুসলিম নয়, বরং শ্রেণিসত্যকে সামনে রাখছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। যে সাতচল্লিশের দাঙ্গার ইতিহাসকে প্রকট সত্য করে তুলে ধরে দেশভাগকে বৈধতা দেওয়া হয় সেই ঘটনা *খোয়াবনামায়* পরিবেশিত হয় অতি তুচ্ছ আর মিথ্যার বেসাতি হিসেবে, আবদুল আজিজের সম্বন্ধী আহসান আলির ভাষ্যে, সে কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুদের আক্রমণের

শিকার এবং শরণাগতও হয় অন্য হিন্দু দোকান-মালিকের কাছে। দেশভাগ যে আদতে ধর্ম আর শ্রেণি-সংগ্রামের জগাখিচুড়ি, এবং কীভাবে সেটা পাকানো হলো তা-ও লক্ষ করা জরুরি :

> পাকিস্তান হাসিলের কর্মসূচিতে চাষির দাবি অন্তর্ভুক্ত হলে সেই স্বপ্ন প্রায় বিশ্বাসে পরিণত হয়।...আখ্যান জুড়ে সেই স্বপ্নটাই বিক্ষিপ্ত ক্রমবিন্যাসে অবয়ব পায়, তেভাগা আন্দোলনের বিস্তার আর কৃষকচেতনায় তার ভাবচ্ছাপ থেকেই মুসলিম লীগ বাধ্য হয়েছিল সেই দাবিকে তাদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে! সেই অকপট আশ্বাসে আর দ্বিজাতি তত্ত্বের গণবিকারে – বাংলার চাষি-কৃষকের সমর্থনে পাকিস্তান আন্দোলন গণোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছিল। সেই প্রবল উত্তালকে যমুনার 'সাত স্রোত আর উনপঞ্চাশ ঢেউ' বলে ভাবলে, কিংবা তেভাগা আন্দোলনকে বিষয়গত ও মনোগত দুটি ধারায় বাঙালি নদীর শীর্ণকায়া স্রোতের রূপকে দেখলে কি ইলিয়াসের নির্মাণের সঙ্গে আরও সহৃদয়তা স্থাপিত হয় না পাঠকের![৩৩]

আর এভাবেই বিষয় নির্বাচনে মন্তাজ তৈরি হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামায়*, যা বুদ্ধিবৃত্তিকে আন্দোলিত করে, বজ্রালোকের মতো পাঠক হৃদয়ে পৌঁছায়। গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং উপনিবেশিত রাজনৈতিক বাস্তবতার ফারাক, বিপরীত-চিত্রে দেখানো হচ্ছে, অথচ এর পাঠকের মননে ছায়া ফেলছে ভিন্ন কোনো খোয়াব। *খোয়াবনামা* বইটিকে যদি কাৎলাহার পাড়ের মানুষের স্বপ্নের দলিল হিসেবে চিন্তা করি তাহলে দেখব, তা হারিয়ে গেছে আবদুল আজিজের আলেম মামাশ্বশুরের কাছে, যার আয়-রোজগারের উৎস পানিপড়া আর তাবিজ বিক্রি। কিন্তু খোয়াবের ব্যাখ্যা করা বইটির সূত্রগুলো তথা মুনসির শোলক রয়ে গেছে তমিজের বাপের নাতনি সখিনার মগজে। পাকুড়গাছ হারিয়ে যায় ইটভাটার গনগনে চুল্লির মধ্যে, খোয়াবনামা হারিয়ে যায় তাবিজ-বেচা আলেমের খপ্পরে–এই আর্থ-রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্যেও শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন আঁকড়ে থাকা স্বভাবে আশাবাদের ক্ষীণ আলো হয়ে থাকে তমিজের বাপের ঠাঁই চোরাবালির পাশে উঁইঢিবির সামনে জ্বলতে থাকা জোনাকিরা। পুনরায় লক্ষণীয়, পাঠকের চিন্তনে greatest-creative-multiple impulse এভাবেই মন্তাজের অনুভূতি যোগায় *খোয়াবনামা* উপন্যাসের বয়ান।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যের বয়ানে নিরীক্ষা-প্রবণতা দারুণভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। তিনি কাহিনির মেজাজে ঝাঁঝালো আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারঙ্গম[৩৪]। তিনি তাঁর পুরো সাহিত্যিক জীবনে মূলত দুইটি উপন্যাস রচনা করেছেন এবং এ কাজটি করার জন্য হাত মকশো করতে পাঁচটি গল্পগ্রন্থের আটাশটি গল্প লিখেছেন। অসংখ্য ফুটনোট/অনুচিন্তন ডায়েরিতে টুকে রেখে আয়াসসাধ্য, পরিশ্রমনিষ্ঠ একটি সাহিত্যিক জীবন যাপন করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাঁর বয়ান-নির্মিতির প্রতিটি ক্ষেত্রে – দৃষ্টিকোণ বাছাই, দৃশ্যায়ন, চরিত্রায়ন, সমাজেতিহাস তথা বিষয় নির্ধারণ – তিনি বিপরীতের যোজনা করেছেন। ফলে, বিষয় ও বয়ানের চমকপ্রদ ধাঁধায় আবেশ তৈরি হয় আর পাঠককুল তাঁর ভাষিক-মন্তাজ দক্ষতা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ আলাউদ্দিন মণ্ডল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : নির্মাণে বিনির্মাণে*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯, পৃ. ৩৮২

২ Sheng-Mei Ma, *East-West Montage : reflections on Asian bodies in diaspora*, Honolulu : University of Hawai, Press, 2007), pp. xi-xii

৩ সত্যজিৎ রায়, *বিষয় : চলচ্চিত্র*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ৩২

৪ প্রাগুক্ত

৫ প্রাগুক্ত

৬ ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমার আঙ্গিক*, কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৯৯৩, পৃ. ৬৪

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৯ ধীমান দাশগুপ্ত [সম্পা.], *চলচ্চিত্রের টেকনিক ও টেকনোলজি*, কলকাতা : বাণীশিল্প, ২০০৬, পৃ. ৭১

১০ এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন : 'উপন্যাসের সংঘাতময়, সাকার ও দৃষ্টিময় ঘটনাপুঞ্জ পাঠক কীভাবে এবং কোথা থেকে প্রত্যক্ষ করবেন, অর্থাৎ ঔপন্যাসিক কার দৃষ্টিকোণ (point of view) বা প্রেক্ষণবিন্দু অবলম্বনে পাঠককে উপন্যাসের সপ্রাণ ঘটনা ও চরিত্রচিত্ত অবলোকন করাবেন– এ-প্রশ্ন উপন্যাসনির্মিতি প্রসঙ্গে নিগূঢ়। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণের শিল্পমার্জিত পরিচর্যাকৌশলেই উপন্যাস চিত্রাত্মক নাটকীয় দৃশ্যানুগ বিবরণধর্মী গীতময় ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে শিল্পসমন্বয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'

– সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০, পৃ. ৯১

১১ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র ২*, *খোয়াবনামা*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ. ৩৩৩

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

১৩ প্রাগুক্ত

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'দুধভাতে উৎপাত', *রচনাসমগ্র ১*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭, পৃ. ১৯০

১৭ শহীদ ইকবাল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: মানুষ ও কথাশিল্প*, ঢাকা : অন্বেষা, ২০০৯, পৃ. ১১০

১৮ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র ২*, *খোয়াবনামা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫

২১ A performance technique of Soviet Montage cinema. The actor's appearance and behavior are presented as typical of a social class or the other group.

–Glossary of Film Terms, University of West Georgia, Retrieved July 30, 2024, from: https://www.westga.edu/academics/university-college/writing/glossary_of_film_terms.php

'নির্বাক চলচ্চিত্র-প্রস্ফুটনের পথে তার শীর্ষমুহূর্ত ঘোষিত হল বিশাল জনতার বিস্তৃত জয়গানে। ব্যক্তি-নায়কের পরিবর্তন ঘটল "mass-hero" তে।...সমষ্টি-কার্য নিয়ে চিত্রকল্প রচনা সে-ই ছিল প্রথম।...প্রচলিত বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে এর চিহ্নিত বৈপরীত্য বিদ্যমান।... আইজেনস্টাইন কথিত individuality within the collective'.

– ধীমান দাশগুপ্ত [সম্পা.], *চলচ্চিত্রের টেকনিক ও টেকনোলজি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০-৯২

২২ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র ২*, *খোয়াবনামা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৬

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪

২৭ প্রাগুক্ত

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

৩০ ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমার আঙ্গিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩১ ইমরান কামাল, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* : সামাজিক ভূগোল ও রাজনৈতিকতা', *সাহিত্যসন্দর্ভ*, বাংলা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় সংখ্যা, ২০২১, পৃ. ৪৮

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৩৩ আলাউদ্দিন মণ্ডল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : নির্মাণে বিনির্মাণে*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯, পৃ. ৪০৩

৩৪ হাসান আজিজুল হক, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ', *আমার ইলিয়াস*, আলাপচারিতা ও সম্পাদনা : চন্দন আনোয়ার, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৫৪